হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) এর দর্শনঃ

বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ভাবনা

ভূমিকা

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) ছিলেন পাক-ভারত উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত ছুফী সাধক। তাঁর চিন্তায়, চেতনায়, চলনে, বলনে ও মননে সর্বদাই ছিলো খোদা ও রাসুলের প্রতি আনুগত্য ও অকৃত্রিম ভালোবাসা। কোরআন হাদিসের প্রতি তাঁর যেমন ছিলো প্রগাঢ় ভালোবাসা তেমনি ছিলো অসামান্য দখল। তিনি কোরআন হাদিসের প্রত্যেকটি নিয়ম নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তিনি প্রত্যেকটি ছুন্নতই যথানিয়মে আদায় করতেন। সৃষ্টির রহস্য, খোদার ইচ্ছা ও নবীজির উপদেশসমূহ তাঁর কাছে ছিলো অত্যন্ত পরিষ্কার। খোদায়ী দাওয়াত প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য তিনি আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। একারণে অসচেতন মানুষকে সচেতন করার জন্য তিনি অসংখ্য পুস্তক রচনা করেছেন। যে সময়ে বা বয়সে সাধারণ মানুষ বিশ্রামে থাকে, সেই বয়সে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানুষের জ্ঞান ও চিন্তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর লেখার উদ্দেশ্য ছিলো সমাজের অনিয়ম ও কুসংস্কার দূর করা, সকলের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দেয়া, মানুষকে কোরআন হাদিসের পথে আহ্বান করা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের জামানায় গ্রন্থ রচনা সহজ কাজ ছিলো না। কিন্তু এই কঠিন কাজটি তিনি অতি সহজে ও স্বাচ্ছন্দে করেছেন। তার লেখা অধিকাংশ গ্রন্থে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বিষয়টি খুব জোরালো ভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান চোখে দেখতেন। তিনি বলতেন দুনিয়ার সকল মানুষই ভাই ভাই। সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন না হলে দুনিয়ায় সুখ আসবে না। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপন খোদারই ইশারা। এই ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে তিনি ১৯৫৮ সালে 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আহ্ছানিয়া মিশনের মূলকথা হলো "স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা"। এখানে সকল ধর্ম বর্ণ ও গোত্রের মানুষ যারা দুর্দশা গ্রস্থ, তাদের সকলের সেবার কথা বলা হয়েছে। এমন কি সকল সৃষ্টির যত্নের কথা রয়েছে।

স্রষ্টার এককত্ব ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে তিনি তাঁর রচিত 'আমার জীবন-ধারা' গ্রন্থের ১৩৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন, " স্রষ্টার এককত্বে পূর্ণ বিশ্বাস আসিলে তাঁহার সমগ্র সৃষ্টি ভ্রাতৃবৎ অনুমিত হয়। বিশ্ব সৃষ্টির সকল বস্তুকেই একই পরিবারভুক্ত মনে করা উচিত, সে সজীব হউক আর নির্জ্জীব হউক। সেই মুর্খ, যে বিনা কারনে একটি বৃক্ষপত্রও ক্রীড়া হেতু নষ্ট করে। সবারই উদ্দেশ্য আছে, সৌন্দর্যময়ের সুন্দর সৃষ্টির কোনো একটীর বিনাশ সাধন করিলে, সুন্দরতমের উপর অশ্লাঘা প্রদর্শিত হয়"। তাঁর মতে মানুষ, জীবজন্তু ও প্রত্যেকটি বস্তুকে ঈশ্বর এক একটি বিশেষ কারণে সৃষ্টি করেছেন। হোক সে নির্জ্জীব কাঠ, পাথর, লোহা, সোনা বা সজীব কোন গাছপালা, লতা, গুল্ম ও কীট পতঙ্গ। প্রতিটি বস্তুর মধ্যে একটি বিশেষ শক্তি ও গুন দিয়ে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। চুম্বকে চৌম্বক শক্তি, স্বর্ণে ও পারদে ঔষধী শক্তি, বিভিন্ন শাক সবজি ও ফলমুলে ভিটামিন বা জীবনী শক্তি এসব তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর করুণা অপার, তাই তিনি দুনিয়ার সকল মানুষের সমান সুযোগ দানের জন্য এগুলো সৃষ্টি করেছেন।

মহানবীর আবির্ভাব ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের উদ্যোগ

খোদার ইচ্ছা পূরণে পৃথিবীতে মহানবীর আগমন হয়। মহানবী খোদার ইচ্ছা পূরণের নিমিত্তে খোদারই নির্দেশে ইসলাম প্রচার করেন। পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য নবীজি সবাইকে হেদায়েত করেন। সবসময়ে তিনি সাহাবীদেরও এই বিষয়ে উপদেশ দিতেন। যা ছিলো পরম করুণাময় আল্লাহরই ইচ্ছা।

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) তাঁর লিখিত গ্রন্থ "আমার শিক্ষা ও দীক্ষা" এর ৭ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন: "মহানবী আসিয়াছিলেন খোদারই ইচ্ছা পূরণ করিতে, তাঁহার সাধের বিশ্বকে শুশোভিত করিতে- শিক্ষা. দীক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা। তিনি

আসিয়াছিলেন সারা বিশ্বের অন্ধকার ও কুসংস্কার দূর করিয়া সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা বিস্তার করিতে। ঝগড়া বিরোধ ও অশান্তি দূর করিয়া সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও একত্ব স্থাপন করিতে, সর্ব্ব জাতিকে গণতন্ত্র দ্বারা একত্রীকৃত করিতে, সকল ধর্মের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখিয়া সারা জগতকে প্রেমের পাশে আবদ্ধ করিতে, স্ত্রী পুরুষকে সমানাধিকার দিতে, দুনইয়ার বুক হইতে অস্পৃশ্যতাকে বিতাড়িত করিতে, ছোট বড় ধনী, নির্ধন সকলকে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ করিতে, জাতি, ধর্ম্ম ও স্থান নির্বিশেষে শান্তির বীজ রোপন করিয়া বিশ্বকে সভ্যতা ও জ্ঞানের শীর্ষ স্থানে উন্নীত করিতে এবং প্রেমালোকে প্রেমিক হৃদয়কে উদ্ভাসিত করত সৃষ্ট ও স্রষ্টার যোগ সাধন শিক্ষা দিতে।" (আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, পৃষ্ঠা: ৭)।

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) এর এই বক্তব্য থেকে প্রতিয়মান হয় যে, ইসলামের ছত্রছায়ায় অন্য সকল ধর্মের সম্মান অক্ষণ্ন রাখিয়া ও অস্পৃশ্যতাকে বিতাড়িত করিয়া পৃথিবীর সকল জাতি, গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়কে প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া একটি সুখি, সাম্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ অপার সুখময় পৃথিবী গঠনই আল্লাহর ইচ্ছা। আর সেই ইচ্ছা পূরণার্থে ধরাধামে নবীজির আগমন। কিন্তু আমরা সেসব কথা ভুলে গিয়ে মঙ্গলময়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাতিতে জাতিতে, গোত্রে গোত্রে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হানাহানি করে মঙ্গলময়ের সাধের পৃথিবীকে ক্রমাগত অশান্ত ও বাস অনুপোযোগী করে তুলেছি। তাই গ্রন্থকার তামাদের ভুল শোধরাবার জন্য তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে ভ্রাতৃত্ববোধ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। তিনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপন সম্পর্কে তাঁর "আমার শিক্ষা ও দীক্ষা" গ্রন্থের ৮ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন: "জাতি নির্ব্বিশেষে খোদার সকল জীবকে ভ্রাতৃবৎ গণ্য করা মহাকর্ত্তব্য। সৃষ্টের আনন্দে স্রষ্টার আনন্দ। যিনি যতই সৃষ্টকে ভালোবাসেন, তিনি ততই স্রষ্টার প্রিয় পাত্র হন। সমগ্র মানবজাতি খোদার সন্তান-সন্ততি স্বরূপ, উহাদের শান্তি-রক্ষণে খোদার সন্তুষ্টি।" (আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, পৃষ্ঠা: ৮)।

তাঁর মতে নবীজিরও ইচ্ছা ছিলো সমস্ত পৃথিবীকে একটি পরিবারের আদলে উন্নীত করা। এ ব্যাপারে তিনি আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। নবীজি তাঁর বিদায় হজের ভাষণেও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি উপস্থিত সাহাবীদেরকে এ বিষয়ে বার বার সাবধানও করেছিলেন। তারপরেও আমরা নবীজির সাবধান বাণী ভুলে গিয়ে এবং তাঁর ইচ্ছাকে গুরুত্ব না দিয়ে সেই অতীতের অন্ধকারময় আরবের বাসিন্দাদের মতো মন্দ আচরণে ব্রতী হয়েছি। এতদ দর্শনে হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) খুবই মর্মাহত হন। তাই তাঁর লেখনী দ্বারা নবীজির ইচ্ছার কথা আমাদেরকে পূণরায় স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি তাঁর "আমার শিক্ষা ও দীক্ষা" গ্রন্থের ৮ নং পৃষ্ঠায় আরো বলেছেন: "সমগ্র পৃথিবীকে এক পরিবার তুল্য গণ্য করাই আঁ-হযরত (স.) এঁর নির্দেশ। আঁ-হযরত পরম শত্রুর জন্য খোদার নিকট দোয়া-প্রার্থী ছিলেন। দয়া ও কৃপা গুণ দ্বারা সকল জাতিকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট মনিব ও চাকরের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিলনা।" (আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, পৃষ্ঠা: ৮)।

সাম্য ও বিশ্ব-ভাতৃত্ব

এত কিছু জানার পরেও আমরা জাতিতে জাতিতে, গোত্রে গোত্রে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হানাহানি করছি, আল্লাহ ও রসুলের নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছি, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে ভুলে যাচ্ছি, প্রতিবেশী গরীব দুঃখী শ্রমজীবি ও বিশেষ বিশেষ পেশাজীবিকে ঘৃণা করা অভ্যাহত রাখছি। এসব দৃষ্টে গ্রন্থকার খুবই কষ্ট অনুভব করেন এবং মানব জাতিকে তার ভুল শোধরানোর জন্য ব্যথিত হৃদয়ে তাঁর "আমার শিক্ষা ও দীক্ষা" গ্রন্থের ৮ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন: "আমরা ভ্রান্ত, তাই কাহকেও নীচ বলিয়া ঘৃণা করি, কাহাকেও ডোম, মেহতর বলিয়া অস্পৃশ্য জ্ঞান করি, আর কাহাকেও বা কাফের আখ্যা দিয়া আত্ম-শ্লাঘা দেখাইয়া থাকি। আমরা অন্তর্বিন নহি, বাহ্য-বিন। লোকের বাহিরটা দেখি, আর ভিতরটা দেখিনা বা দেখিবার ক্ষমতাও রাখিনা।" (আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, পৃষ্ঠা: ৮)।

আমরা নিজেদেরকে খুব বড় ভাবি, আবার কাউকে কাউকে নীচ ভেবে ঘৃণা করি। আমরা ডোম, মেথর, ছুইপার, হাজাম, কাহার, ধোপা, চর্মকার প্রভৃতি পেশাজীবিকে নীচ ভাবি ও ঘৃণা করি। কিন্তু পেশাগত কাজের কারণে কেউ নীচ নয়। প্রকৃত নীচ সেই যে

স্রষ্টার প্রেম বর্জিত, সৃষ্টিকর্তার প্রতি যার আনুগত্য নাই এবং যার প্রাত্যহিক জীবনে স্রস্টার নির্ধারিত নিয়মের প্রতিফলন নাই। আমরা জানি মানুষের দুটি হাতই তার জন্য সমান প্রয়োজন। একটি হাত না থাকলে সে অপূর্ণ মানুষ। পৃথিবীতে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে হলে এবং বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাজ সহজ ও নিঁখুত ভাবে সম্পাদনের জন্য প্রত্যেকটি মানুষের দুটি হাতই সমানভাবে প্রয়োজন। এর একটির অভাব ঘটলে মানুষের জীবন দূর্বিসহ হয়ে পড়ে। ডোম, মেথর, ছুইপার, হাজাম, কাহার, ধোপা, চর্মকার প্রভৃতি পেশাজীবি আল্লাহরই সৃষ্টি, তারা আমাদের দৈনন্দিন কাজকে সহজ করে দেয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের পরিবেশকে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর রাখতে সহায়তা করে। তারা না থাকলে তাদের কাজগুলো যদি আমাদের নিজেদের করতে হতো তাহলে আমাদের কেমন লাগত? নিশ্চয়ই ভালো লাগত না। তাদের না থাকাটার অর্থ হলো সমাজের দুটি হাতের একটি হাত নষ্ট হওয়া। একারণে একজন মানুষ হিসেবে এদেরকে ঘৃণা না করে ভালোবাসা উচিৎ। কিন্তু আমাদের মত শিক্ষিত সমাজই এদেরকে ঘৃণা করে। এসব দৃষ্টে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে প্রখ্যাত ছুফী সাধক হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র) তাঁর "ভক্তের পত্র" গ্রন্থের ৭৭ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন: "দুইটি হাতকে সমানভাবে দেখ, কাহাকেও ঘৃণা করিও না; উভয়ই আমাদের মঙ্গল হেতু। যে হাত ময়লা পরিষ্কার করে সেও যেমন আদরের, আর যে হাত মুখে আহার পৌছায় সেও তেমনি আদরের। কোন পার্থক্য করিবে না; যদি বাম হাতের অভাব হয়, তবে জীবন ভয়াবহ হইয়া উঠে।" (ভক্তের পত্র, পৃষ্ঠা: ৭৭)।

এ বিষয়ে আরও একটি উদাহরণ হলো তার লেখা গ্রন্থ 'ছুফী' এর ৩৩ নং পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, "সমস্ত লোকই হযরত আদমের সন্তান ও মৃত্তিকা হতে সৃষ্ট।"

এ বিষয়ে তিনি তাঁর লেখা গ্রন্থ "ছুফী"-এর ১০ নং পৃষ্ঠায় আরও বলেছেন: "বায়ু, জল, অগ্নি, মৃত্তিকা ও খাদ্য সকল দেশের জন্যই মনোনীত। স্রষ্টা দেশ কিম্বা কাল বিশেষের জন্য তাঁহার অনুগ্রহ সীমাবদ্ধ করেন নাই। সর্বত্র, সর্বকালে, সর্বজাতি সমভাবে তাঁহার দান উপভোগ করে। তিনি সকল জাতীর প্রতিপালক, সকল যুগের প্রভু, সকল দেশের শাসক, সকল অনুগ্রহের প্রস্রবণ, সকল ক্ষমতার অধীস্বর, সকল বস্তুর প্রতিপালক।"

আমরা জানি ইসলাম সাম্য, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সুতিকাগার। ইসলাম ধর্মই মানুষের সাম্য ও ঐক্যের উপর বেশী জোর দিয়েছে। মানুষের মধ্যে সাম্যভাব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে আপনা আপনিই ভ্রাতৃত্ববোধ জন্ম নেয়। ভ্রাতৃত্ববোধের বিশ্বব্যাপি প্রসারই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ছাড়া বিশ্ব শান্তির কোন আশা নাই। বর্তমান সময়ে, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের অভাব হেতু দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, গোত্রে গোত্রে হানাহানি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আগ্রাসন ও যুদ্ধ প্রস্তুতি। হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সাম্য, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের উন্নয়ন ঘটলে এইসব হানাহানি, আগ্রাসন ও যুদ্ধ প্রস্তুতি চিরতরে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। তাঁর মতে, ইসলাম ঐক্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাই তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আমার শিক্ষা ও দীক্ষা' এর ২০ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, "সাম্য, একতা ও ভ্রাতৃত্ব আমাদের চরম লক্ষ্য।"

স্রষ্টার প্রতি মহব্বত ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) এর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি খোদার প্রতি মানুষের মহব্বতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে খোদার উপর অকৃত্রিম প্রেমই জীবের মুক্তির একমাত্র পথ। খোদার প্রতি প্রেমের ভিত্তি হলো খোদার সকল সৃষ্টির উপর প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান চোখে দেখা অর্থাৎ মানুষে মানুষে পৃথক না করা। কোন মানুষ যদি সকল সৃষ্টি ও সকল মানুষকে সমানভাবে ভালোবাসতে পারে, তাহলে তার সেই ভালোবাসা খোদাতে সমর্পিত হয়। অর্থাৎ খোদা নিজেই তার ভালবাসা গ্রহণ করেন। আবার খোদার প্রতি কারও প্রকৃত প্রেম জন্মিলে সে কোন মানুষকে ঘৃণা করতে পারে না বা কারো অমঙ্গল কামনাও করতে পারে না। এ বিষয়ে তিনি তাঁর লেখা গ্রন্থ "ছুফী"-এর ৬৪ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন: "স্রষ্টার প্রতি অটুট প্রেম হলে সৃষ্ট জীবের প্রতি ভালবাসা জন্মে।"

একইভাবে তিনি তাঁর লেখা গ্রন্থ "ছুফী"-এর ৬৬ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন, "খোদার উপর পূর্ণ মহব্বত জন্মিলে তাঁহার প্রেরিত কোরআনের উপর এবং তাঁর মাহবুব নবী করিমের উপরেও অটল ভালবাসা ও ভক্তি জন্মে। অবশেষে তাঁহার সৃষ্ট বস্তুর উপর ভালবাসা বিস্তৃত হয়।"

কালজয়ী এই ছুফীসাধক মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, পৃথিবীর সকল মানুষই সমান। সকল মানুষই একে অপরের ভাই। খোদার প্রেমে মশগুল এই ছুফীসাধক ভ্রাতৃত্ববোধের বিশ্বাস থেকে তাঁর প্রণীত গ্রন্থ "ছুফী" এর ১০ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,

"ছুফী জাতি, স্থান ও কাল নির্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন করেন, সকলকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান করেন। তাঁহার নিকট কোনো ভেদাভেদ নাই। জগত পিতার রাজ্যে সকলেই এক সমাজ ভুক্ত।"

তিনি বলেছেন, পৃথিবীর সকল সকল ধর্ম, সকল জাতি, সকল গোত্র এমনকি সকল পশু পাখি, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতাদিও আল্লাহ নিজের হাতেই সৃষ্টি করেছেন। তাই প্রত্যেকটি জীব ও জড় বস্তুর উপর তাঁর অসীম ভালোবাসা। তাঁর এই ভালোবাসার বস্তুকে যদি কোন মানুষ অপমান বা ঘৃণা করে অথবা ছোট করে দেখে, তাহলে তিনি অখুশি হন এবং তার শাস্তি অনিবার্য। আর যদি কেউ সকল সৃষ্টিকে সমান চোখে দেখে ও সমানভাবে ভালোবাসে, খোদা তার উপর খুশি হন। তখন তার উপর খোদার রহমত বর্ষিত হতে থাকে। কে ভালো, কে মন্দ, কে পাপী, কে পূর্ণবাণ, কে শাস্তি পাবে, আর কে পুরস্কৃত হবে, এসব চিন্তা বৃথা। কারণ দয়াময় কাকে করুণা করবেন, আর কাকে শাস্তি দিবেন, তা তিনিই জানেন। এবিষয়টি আমাদের জ্ঞান ও চিন্তার অতীত। এ বিষয়টিও গ্রন্থকার তার "আমার শিক্ষা ও দীক্ষা" গ্রন্থের ৯নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন: "সকল ধর্ম্ম, সকল জাতি, সকল স্থান খোদাই স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রত্যেকের জন্য তাঁহার সমান যত্ন, সমান ভালোবাসা, সমান করুণা। তিনিই অবগত কে শান্তি বা পুরস্কারের উপযোগী সেই বিচার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা আমিত্বের ধোকায় বা ধর্ম্মের বড়াইতে কাহাকেও অপরাধী মনে করি, কিন্তু দয়াময় খোদা তথা-কথিত অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে শরমেন্দা করিতে পারেন এবং অসমীচিনতার দরুণ আমাদিগকে দায়ী করিতে পারেন। স্বীয় হীনত্ব মনে রাখিয়া অপরের প্রতি কু-আখ্যা প্রয়োগ হইতে আমাদিগকে বিরত থাকা উচিত।"

তিনি এতিম অসহায়দের জন্য খুবই চিন্তিত থাকতেন। তাদের উন্নতির জন্য তিনি নিজের সাধ্যমত সম্ভব সবকিছু করতেন এবং এদের সহায়তা দানের জন্য পরিচিত জনদের কাছে অনুরোধ করতেন। তিনি ভাবতেন, এরাও আমাদের সমাজের একজন। এরা আমাদের অসহায় ভাই বোন। এদের সুন্দরভাবে বাঁচা ও বাড়ার সুযোগ করে দেয়া আমাদেরই কর্তব্য। কে জানে সুযোগ পেলে এদেরই একজন আল্লামা রুমী বা হাফিজের মতো হবে না। একারণে এদেরকে সহায়তা দানের জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করতেন। এরকম একটা অনুরোধ আমরা তাঁর 'ভক্তের পত্র' গ্রন্থের ৭৩ নং পৃষ্টায় দেখতে পাই। এখানে তিনি জনৈক ভক্তকে বলেছেন: "এতিমদিগকে ভাসাইওনা, সকলকে আপন করিয়া লও। তুমি ব্যতীত তাহাদের অশ্রু মুছাইবার কে আছে? দেখিও ছিন্ন পুষ্পগুলি যেন অজ্ঞাতে পদ দলিত না হয়।

এতিম ও অসহায়দের ক্ষেত্রে তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, শত্রু, মিত্র এসবের উর্দ্ধে গিয়ে কাজ করতে বলেছেন। এখানে তাঁর হৃদয়ের বিশালতা, সকল মানুষকে একই চোখে দেখা ও ভ্রাতৃত্ববোধের জলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর এক ভক্তকে লেখা পত্রটি এরই উকৃষ্ট উদাহরণ। 'ভক্তের পত্র' গ্রন্থের ১০০ নং পৃষ্ঠায় তিনি এক ভক্তকে বলেছেন: "মুক্তদ্বারে সকলকে আহ্বান করিয়া মহব্বতের ডোরে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর, শত্রু-মিত্র, হিন্দু-মুসলমান সকলকে আপনার করিয়া লও, স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ কর, দুইহাতে ভালোবাসা বিলাইতে থাক, "ছিনা চাক" করিয়া অসন্তোষ ভাবগুলি উপড়াইয়া ফেলো, শয়তানকে গণ্ডির মধ্যে আসিতে দিওনা। কেবল মহব্বতকে জীবনের দোসর করিয়া লও।"

সার্বজনীন শব্দের ব্যবহার ও ভ্রাতৃত্ববোধ

হযরত খান বাহাদুর আহ্ছান্উল্লা (রহ.) এর একটি বড় গুণ ছিলো তাঁর গ্রন্থসমূহে সার্বজনীন শব্দের ব্যবহার। সার্বজনীন শব্দ হলো এমন সব শব্দ যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকাংশ মানুষের মুখের কথা। যেসব শব্দ অতি সহজে সকলে বুঝতে পারে এবং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে বলতে ও শুনতে অভ্যস্ত। যেমন মা, বাবা, জল, প্রভু, শমন, দয়াময় ইত্যাদি। এই সকল সার্বজনীন শব্দের ব্যবহারের ফলে রবীন্দ্র-নজরুলের রমরমা অবস্থার মধ্যেও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ বাঙালি আগ্রহ ভরে তাঁর গ্রন্থগুলি পড়েছে ও তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। এবাদত সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি 'ভক্তের পত্র' গ্রন্থের ৭২ নং পৃষ্ঠায় এক ভক্তকে বলেছেন: "আকর্ষণই প্রকৃত, বস্তু অপ্রকৃত। আকর্ষণকে পূজা করিবে, বস্তুকে পূজা করিবেনা। আকর্ষণের দূরত্ব নাই, দূরত্ব বস্তুতে। বুঝিলে তো? আবার ঈদ আসিলে বুঝিবে, এসব কথা অনুভব করিবার তর্ক করিবার নহে।"

এখানে তিনি এবাদতকে পুজা বলে একদিকে যেমন বাঙালি জাতির প্রাণের ভাষা 'বাংলা ভাষা' ব্যবহারের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলার কোটি কোটি পাঠকের মনে দাগ কেটেছেন, সাথে সাথে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও মহত্বতার পরিচয়ও দিয়েছেন। এই ধরনের অনেক সর্বজনীন শব্দ তিনি তাঁর লেখা গ্রন্থসমূহে ব্যবহার করেছেন। এখানে এরকম কিছু শব্দ, যেমন: পিতা, মাতা, জগত পিতা, স্রষ্টা, ঈশ্বর, প্রভু, মহাপ্রভু, স্বর্গ, স্বর্গীয় আনন্দ, মিশন, প্রার্থণা, অর্চ্চনা, সন্যাস, ব্রত, আত্মা, মহাত্মা, ইন্দ্রিয়, পরলোক, জল, শমন, অনন্তধাম, পবিত্র, বিভুপদে, মঙ্গলগীতি, দয়াময়, তাপস, সাধক, কৃপাময়, গলবস্ত্রে প্রার্থণা, ইত্যাদি। এই সকল শব্দ ব্যবহার করায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল পাঠক তার গ্রন্থগুলি পড়তে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এ কারণে তার লেখাগুলো পড়ার প্রতি পাঠকরা উৎসাহিত হয়। ফলশ্রুতিতে তাঁর উল্লিখিত সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্ববোধের মূলমন্ত্র পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা ভ্রাতৃত্ববোধ বিষয়ে ইতিবাচক আচরণে অভ্যস্থ হতে থাকে। আমার মনে হয় বিশ্ব ভাতৃত্ব উন্নয়নে তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও মহত্বতা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃত্ববোধ

অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ সকলতে মোহিত করে। তিনি ব্যক্তি বিশেষের মত অন্য ধর্মের প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন করেন নাই। তার জীবদ্দশায় তিনি কখনও অন্য ধর্মের নেতিবাচক সমালোচনা বা কোন কুৎসা রটনা করেন নাই। তিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই কথা বলতেন। তার এ নীতির জন্য ভারতীয় উপমহাদেশের সকল ধর্মের মানুষই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বিদের অনেকেই তাঁর নিকট থেকে পরামর্শ নিতেন। তাঁর 'ভক্তের পত্র' গ্রন্থটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে যে কোন পাঠক বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন। অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধের উদাহরণ হিসেবে নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরা হলো: "মহাপুরুষদিগের জীবনী অনুধাবন কর, তাঁহারা কত উৎকট পরীক্ষা সাধন করিয়াছেন।"
গ্রন্থের নাম 'ভক্তের পত্র' পৃষ্ঠা নং-৮৯।
এখানে মহাপুরুষ বলতে তিনি শুধু ইসলাম ধর্মের মহাপুরুষদের কথা না বলে অন্যান্য ধর্মের মহাপুরুষদেরও উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়ের উদাহরণ হিসেবে তাঁর প্রণীত 'বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী' গ্রন্থটির কথা বলতে হয়। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন: "স্রষ্টা দয়ার সাগর, রহমানুর রহিম। তিনি যুগে যুগে ভ্রান্ত মানব কুলের পথ নির্দেশের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন পথ প্রদর্শক প্রেরণ করিয়াছেন। কাজেই কোন জাতিকে, কোন সম্প্রদায়কে, কোনো ধর্ম্মকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা সমীচীন নয়।"

তিনি যে অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তার উদাহরণ হলো তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থ। যথা-

১. বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী
২. ইছলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি

তাঁর প্রণীত 'বিভিন্ন ধর্ম্মের উপদেশাবলী' গ্রন্থে গ্রন্থকার কোরআনের বাণী, হিন্দু ধর্ম্মের বাণী ও নবীজির বাণী ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মের আরও ১২ জন মহাপুরুষের বাণী তুলে ধরেছেন। এইসব মহাপুরুষের মধ্যে রয়েছেন- সরথুস্ত্র, তীর্থঙ্কর মহাবীর, কনফুসিয়াস, বুদ্ধদেব, যীশু খ্রীষ্ট, শ্রী শঙ্করাচার্য্য, শ্রী রামানুজাচার্য্য, গুরু নানক, শ্রী চৈতন্যদেব, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ প্রমূখ।

হিন্দু ধর্মের মনীষীদের উপদেশাবলীকে গুরুত্ব দিয়েই তিনি 'ইছলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি' শিরোণামের গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি হযরত মোহাম্মদ (স.) ও হযরত হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ (রহ.) এর উপদেশাবলীর সাথে সাথে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন।

আমরা জানি যে, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যক্রমসমূহ খুব পছন্দ করতেন। রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁর যাতায়াত ছিলো এবং মিশনের মহারাজদের সাথে তিনি ধর্ম সমাজ ও সামাজিক কুসংস্কার নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যক্রমসমূহকে তিনি সমাজ সেবার মডেল মনে করতেন। তাই তাঁর এক ভক্তকে দুঃস্থদের সেবা করার পরামর্শ দেয়ার সাথে সাথে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের কাজের ভূয়সী প্রসংসা করেন। তিনি একজন সৎ, নিরপেক্ষ ও উদার মনের মানুষ বলে তার পক্ষে অন্য ধর্মাবলম্বিদের কাজের এমন প্রশংসা করা সম্ভব। 'আমার শিক্ষা ও দীক্ষা' গ্রন্থের ১৯ নং পৃষ্ঠায় তার উক্তিটি হলো:

"এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের কথা উল্লেখযোগ্য। দুঃস্থের সেবা করাই উক্ত মিশনের লক্ষ্য। ইহার দ্বারা কত স্থানে হাসপাতাল, শিক্ষা-মন্দির, পান্থশালা প্রস্তুত হইতেছে, আর আমরা নিজের সেবায় দিবারাত্র ব্যস্ত। মোছলেম সমাজে এই অভাব দেখিয়া "আহ্ছানিয়া মিশন" নামে একটি সমিতি গঠন করা হইয়াছে। অপরের খেদমত করাই ইহার উদ্দেশ্য; অন্য উদ্দেশ্য হইতেছে- ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, দুঃখীর অভাব নিরাকরণ, শিশু ও বয়স্কদিগের দীনিয়াত শিক্ষা দান, পরদা সংরক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন ইত্যাদি।"

তিনি খোদা ভক্তদের গুরুত্ব বুঝাতে হিন্দু ধর্মাবলম্বিদের একটি প্রবাদ তাঁর 'আমার শিক্ষা ও দীক্ষা' গ্রন্থের ২৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। উক্তিটি এরূপ: "হিন্দু সাধুদের একটি প্রবাদ-বাক্য আছে, 'ভগবান ভক্তের ভক্ত'। যিনি খোদার প্রিয়, খোদাও তাঁহার প্রিয়। অলি-আল্লাহ খোদার আশেক, আবার খোদাও অলি-আল্লাহর আশেক। দুনইয়ায় এশ্ক হইতে অধিকতর মূল্যবান নেয়ামত আর নাই।"

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) এর অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের আর একটি উদাহরণ হলো, তাঁর এক শিষ্যকে কোনো একটি মনোরম, পুতপবিত্র ও নির্জন স্থানের বর্ণনা দেওয়ার সময় তিনি কৃষ্ণ লীলার উপমা দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনের বায়ূ ছিলো নির্মল, শ্রীকৃষ্ণ যমুনা তীরের কদম তলায় বসে, সুমধুর সুরে বাঁশি বাজিয়ে তার লীলা সঙ্গীদের ডাকতেন। যমুনা তীরের নির্মল বায়ূ ও সুমধুর বাঁশির সুর মিলে এক মোহনীয় পরিবেশ তৈরি হত। গ্রন্থকার ওই সময়ে যে স্থানে অবস্থান করছিলেন তার বর্ণনা দিতে বলেছেন: "এখানকার নিষ্কলঙ্ক পবন সুমধুর তানে মুরলী বাজাইয়া কত তপ্ত বক্ষে কৃষ্ণ গোপীর বিশুদ্ধ লীলার কথা জাগাইয়া দেয়।" (ভক্তের পত্র পৃষ্ঠা-৬১)।

উপসংহার

উপরের আলোচনা ও হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংকলিত গ্রন্থকারের বিষয়ভিত্তিক বক্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝা যায় যে, হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) যেমনিভাবে খোদা, খোদার রসুল ও খোদায়ী কিতাব কোরআন শরীফকে ভালোবাসতেন, তেমনিভাবে ভালোবাসতেন আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে। তার কাছে কোনো মানুষ ছোট বড়, উঁচু নিচু, পবিত্র ও অস্পৃশ্য ছিল না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকলকে তিনি সমান চোখে দেখতেন। তিনি ভাবতেন আমরা সকলে আদম সন্তান, স্রষ্টা একই মাটি দিয়ে একই উদ্দেশ্যে নিজের হাতেই মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে এসে যদি কেউ বিপথে চালিত হয়, সেটির বিচারের দায়িত্ব আল্লাহ নিজের হাতেই রেখেছেন। তিনি বিপদগামীকে

শাস্তি দিতে পারেন আবার ক্ষমাও করতে পারেন। এসব বিষয় নিয়ে আমাদের ভাববার কিছু নাই। আমদের ভাববার বিষয় হলো আল্লাহ সকল মানুষকে সমান মর্যাদা, সমান বৈশিষ্ট্য ও সমান গুণাবলী দিয়ে, একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সকলের সুবিধার জন্য আকাশ বাতাস, পানি, অক্সিজেন, খাদ্য, গাছপালা ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। তিনি চান দুনিয়ার মানুষ তার রহমতের কথা স্মরণ করুক এবং দুনিয়াতে ভাই ভাইয়ের মতো মিলে মিশে বসবাস করুক। নবীজিরও একই অভিপ্রায়। তাহলে জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হয়ে আমরা কেনো মানুষে মানুষে বিভেদ করবো? আমরা কেনো ভাই বোনের মতো থাকতে পারবো না? আমরা কেনো সবাইকে সমান চোখে দেখতে পারবো না? এসব চিন্তা থেকেই হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) আল্লাহ রসুলের ইচ্ছা পূরণে মানব সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই কাজটি ত্বরান্বিত করতে তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীতে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

সব শেষে বলা যায় যে, হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) একজন বিখ্যাত ছুফী সাধক ছিলেন। তাই তাঁর মনে বিন্দু মাত্র হিংসা, দ্বেষ, অহংকার ও ঘৃণা ছিলো না। তিনি মনে প্রাণে চাইতেন যে, মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হোক ও দিনে দিনে এর প্রসার লাভ করুক। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি ইসলামের একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তাই তিনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রসারের জন্য তার রচিত গ্রন্থগুলিতে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। পাঠকগণও এসব গ্রন্থ পড়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ব্যপারে দিন দিন সচেতন হচ্ছেন এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ধারণাটি দিন দিন জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ফলে সমাজে অস্পৃশ্যতা ও কুসংস্কারের পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁর এই গ্রন্থাবলী বাঙালি সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে।

গবেষণা ও রচনায়: রঘুনাথ দাস
ফ্যাকালটি মেম্বার: সিনেড, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।
সহযোগিতায় : কাজী আলী রেজা
পরিচালক: পি আর ডি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

তথ্যসূত্র:

১. আমার জীবন-ধারা, হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)
২. আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)
৩. আহ্ছানিয়া মিশনের মত ও পথ, হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)
৪. ছুফী, হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)
৫. বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী, হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)
৬. ইছলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি, হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)
৭. ভক্তের পত্র, হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)
৮. সৃষ্টিতত্ত্ব, হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)